Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ডাক ও খনার বচন

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.1
Pages	1-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ডাক ও খনার বচন

সৈয়দ আলী আহসান

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারে চর্যাগীতিকার যে পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন তার সঙ্গে 'ডাকার্নব' বলে একটি পুথিও তিনি দেখেছিলেন। 'ডাকার্নব' সম্পর্কে তিনি নিজে কোনো বিশ্লেষণ করেননি এবং তার পরবর্তী পণ্ডিতগণও 'ডাকার্নব' সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, "ডাকার্নব নামে একটি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানগুলি কি ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি সেই অংশগুলি ইউরোপে পাঠাইবো স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও শেষ দোহাগুলি আমার বাঙ্গালা বলিয়া মনে হয়।" তিনি যে দোহা-গুলো উদ্ধৃত করেছিলেন তা নিম্নরূপ:

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু॥
লোঅণ করুণা ভাবহ তুম্ম।
সঅল সুরাসুর বুদ্ধহ জিম্ম॥
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই।
ইবোহ করহ চিত্ত জিণ না হই॥

ডাকার্নবের মধ্যে ডাকিনী তন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা আছে। সংস্কৃত টীকায় যাকে বলা হয়েছে, "মহাযোগিনীতন্ত্ররাজ্যে জ্ঞানার্ণবাবতারঃ।" অর্থাৎ এখানে সকল ডাকিনীকে অর্থাৎ মহাদেবীর সকল রূপকে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়েছে:

মাতা চ ভগিনী পুত্রী ভাগিনেয়ী চ স্বসৃকা।
বান্ধবী পিতৃভির্ম্মাতা মাতুলস্য তু ভার্য্যকা॥

পদ্মিনী শঙ্খিনী চিত্রী দন্তিনী মদনবিহ্বলা।
রূপিণী শব্দিনী গন্ধী রসা স্পর্শশ্চ মানিনী॥

'ডাকার্নবে' বলবার চেষ্টা করা হয়েছে যে জনমুক্তির জন্য করুণা-রূপের উদ্ভবের প্রয়োজন এবং এই পৃথিবীতে মানুষ বিবিধ কর্মের মধ্যে যে লিপ্ত থাকে সেই কর্মের মধ্যে লিপ্ত থেকেও মানুষ কি করে ইন্দ্রিয় বিষয়কে নাভিমণ্ডলে স্থিত নৈরাত্ম স্বভাবকে আবিষ্কার করতে পারে।

'ডাকার্নবে'র ভাষা সম্ভবত পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামীণ অপভ্রংশ। এর শব্দ-গুলোর সঙ্গে সরহপা কিংবা কাহ্নপার দোহাকোষের ভাষার সুস্পষ্ট মিল নেই। সরহপার ভাষা এবং কাহ্নপার ভাষার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ-মান ভাষার নিদর্শন পাই। কিন্তু ডাকার্নবের ভাষা একেবারেই আট-পৌরে, তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের চলিত বুলি। তবে মূল ভাবানুষঙ্গে তন্ত্রের প্রবল প্রতাপ রয়েছে এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের সম্যক প্রশস্তি রয়েছে। ডাকার্নবের মধ্যে আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবরণ পাই এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্চা নিয়েও কিছু বিচার বিবেচনা এর মধ্যে আছে। এতে এই বিশ্বাস আমাদের মনে জাগে যে ডাকের বচন বলে যে সূক্তি এবং প্রবাদ আসামে এবং বাংলাদেশে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেগুলোর আদি গ্রন্থ ডাকার্নব।

'ডাক' কোনো মানুষের নাম নয় 'ডাক' হচ্ছে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। অসমিয়া সাহিত্যে 'ডাক'কে সে ভাষার আদি কবি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তারা 'ডাক' নামক এক ব্যক্তির অস্তিত্ব মান্য করেন এবং বলে থাকেন যে 'ডাক' মহাপুরুষের জন্মস্থান হচ্ছে কামরূপের বড়-পেটার নিকট লেহী ডাঙ্গরা নামক স্থানে। এর অধিক তারা আর কিছু বলেন না। তাতে মনে হয় এই জন্মস্থানের কথা, একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্ত। বুদ্ধিবন্ত এবং চতুরতার প্রতীক হিসাবে 'ডাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। দেশের সর্বত্র বাগ্বিলাসপূর্ণ চতুর উক্তি একজন মহা-পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন এটা নিছক একটি কাল্পনিক অনুধ্যান। তাছাড়া ডাকের সূক্তিগুলো শুধু যে আসামেই পাওয়া যায় তাই নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও পাওয়া যায় এবং উড়িষ্যায়ও পাওয়া যায়।

স্থানীয় কিছু হেরফেরসহ একই প্রবচন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। ডাকের একটি বিশেষ প্রবচন যা আসাম অঞ্চলে এখনো পাওয়া যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

জবে ধর্ম করিবা জানি,
পুখুরি খানিয়া রাখিবা পানি,
বৃক্ষ রোপণত অধিক ধর্ম,
মঠ-মণ্ডপ শোভণ কর্ম,
অনিত্য দেহীত নাহিকো আস,
ধনে জনে বস্ত্রে কিবা বিশ্বাস॥

দেখা যাচ্ছে এই উক্তিগুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী এবং ধর্মসাধনের নির্দেশ বহন করছে।

বাংলাদেশে উপরের বচনটি নিম্নরূপে পাওয়া যায় :

ধর্ম করিতে যে জন জানি।
পুকুর দিয়া রাখিয় পানি॥

গাছ রুহলে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম॥

আসামের ডাকের বচন বা সূক্তি বাংলাভাষায় কিছুটা পরিবর্তিত রূপে পাই, যেমন—

১ আসামী: কুচ্ছিত নারীত যাহার বাস।
তাহার কোন জিয়নত আস॥
অল্প বলিলে পারয়ে গালি।
ডাকে বোলে তাকে খেদ নিকালী॥

বাংলা: উচিত বলিতে পাড়ে গালি।
পোয়ে বিয়ে হয় বেয়ালী॥
এ নারীতে যাহার বাস।
তাহার কোন্ জীবনের আস॥

২ আসাম: যি নারী প্রভাতে নিদ্রাক যায়।
বাসি শয্যাত সূর্য পায়॥
উদয় কালত নিলিপে ঘর।
ডাকে বোলে তাই ছাড়িয়ো নর॥
নুরছে যিজনী স্বামীর পাশে।
পরমুখ চাই মুচকাই হাসে॥

পিংগটা নয়নে চঞ্চলা আতি।
কেরা নয়নে কুলটা জাতি ॥
যার পেট পিঠি উক্ত ললাট।
তাই দেখিলে চারিবা বাট ॥
স্বামী বধে মারে দেওর।
ডাকে বোলে তাইক চারিয়ো নর॥
দিনত যে জনী থাকে ঘুমাই।
স্বামী খংগত বোলে বোপাই ॥
অল্প খাই পেলাই প্রচুর।
ডাকে বোলে তাইক করিয়ো দুর॥

বাংলা: প্রভাতকালে নিদ্রা যায়।
বাসি শয্যা সূর্য না পায়॥
উদয় হৈলে ছড়া।
সাঁজ হৈলে ভাড়া॥
তা গৃহিণীর ধরিয়া মুখ পোড়া॥
ঘরে স্বামী বাইরে বইসে।
চারি পানে চায় মুচকী হেসে॥
পিংগল আঁখি, চপল মতি।
ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি॥
পেট পিঠ উচ্চ ললাট ।
দেখ যদি ছাড়িহ বাট ॥
দেওর বধে স্বামী মারে।
ডাকে বলে কাজ কিবা তারে।

যে নারী দিনে নিদ্রা যায়।
গালি দিলে রোষ করিয়া ধায়॥
ফেলায় খায় চায় প্রচুর।
ডাকে বলে নিকাহল দূর॥

৩ আসামী: যি গৃহিণীর আউল কেশ।
কন্দল করে বিপরীত বেশ॥
অল্প খাই পেলাই প্রচুর।
ডাকে বোলে তাইক করিও দুর॥

বাংলা: যে নারী আউদর মুণ্ডী।
খায় দায় না পালে হাণ্ডী॥
ফেলায় খায় চায় প্রচুর।
বলে ডাকে নিকালিহ দুর॥

৪ আসামী: সর্ব গুনিয়াক নাটয় ভাতে।
দুষ্ট পুত্র যার, নিতান্ত কান্দে॥

বাংলা: মূর্খ পুত নষ্ট স্ত্রী।
এর চাইতে কষ্ট কি॥

৫ আসামী: নষ্ট গৈল নারী বেহাই হাট।

বাংলা: নষ্ট বহু পরের ঘরে॥

৬ আসামী: ও চরত পুখুরী দূরক যাই।
পরর আশায় বাটক চাই॥
আর দৃষ্টি করি হাসিয়া চাই।
অবসর পাইলে বাজক ঠাঁই॥

বাংলা: নিয়ড় পোখরী দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউড়ে চায়॥
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি।
ডাক বলে---সেই সে নষ্টী॥

৭ আসামী: ধবনী মালিনী নটা গোয়ালী।
সদা পরিহাস বচন ভালি॥
যার কোন কথা হাসিয়ে সার।
ডাকে বোলে সেই দুষ্টকে ছার॥
ঘরে ছুলি রান্ধে বাহিরে।
অল্প ছুলি ফালি রান্ধয় শিরে॥
ব.টে ঘন ঘন উলতি চাই।
পর পুরুষত থাকে অভিপ্রায়॥

বাংলা: ধোবানী মালিনী গোয়ালিনী ।
তাদের লইয়া রস কাহিনী ॥
কন কথা হাসি সার।
বলে ডাক নির্জাস জার॥
ঘরে আথা বাইরে রান্ধে।
আর কেশ ফুলাইয়া বান্ধে॥
ঘন ঘন চাহে উলটিয়ে ঘাড়।
বলে ডাক এ নারীর ঘর উজার॥

৮ আসামী: স্বামীর সেবা গোধূলী বাতি।
ডাকে বোলে সেই লক্ষীর জাতি॥
রৌদ্রত কাটিকুটি ঘরে শুকাই।
বর্ষা চারি মাসে বসিয়া খাই॥
শ্বাশুরিত পুছে করে আয় ব্যয়।
সে নারীক সদ লক্ষীনে রয়॥
কাখত কলসী নদীক যাই॥
তল মণ্ড কর কাকোন চাই।
যি পথে যাই সি পথে আসে।
ডাকে বোলে ভাল মনত ভাসে॥

বাংলা: স্বামীর সেবা, সাঁজে বাতি।
ডাক বলে লক্ষীর স্থিতি॥
রোদ্রে কাটা-কুটায় রান্ধে।
খড়-কাঠ বর্ষাকে বান্ধে।

আয়ে ব্যয় করে শাশুড়ী পুছে
সর্বকালে স্বামী পুজে॥
কাঁধে কলসী পানিকে যায়।
হেট মুণ্ড কাকেও না চায়॥
যেন যায়, তেন আইসে।
ডাকে বলে গৃহিণী সে॥

দেখা যাচ্ছে যে ডাকের বচন মূলতঃ কৃষি কর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চর্যাগীতিকায় কৃষিকর্মের কথা আছে কিন্তু অন্যান্য কর্ম সাধনের কথাও আছে। ডাকের বচনে শুধুই কৃষিকর্মের কথা। এভাবে সহজেই প্রত্যয় হয় যে ডাকের সূক্ত বা বচন এমন কোনো এলাকার যেখানকার কর্মসাধনের মূল উপপাদ্য হচ্ছে কৃষি। তাহলে যে অঞ্চল বা অঞ্চলগুলো আমাদের বিবেচনায় আসে তা হচ্ছে বাংলাদেশ, আসাম, উড়িষ্যা। ডাকের বচন বাংলাদেশেও পাওয়া যায়। আসামেও পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলোর উদ্ভব উভয় অঞ্চলেই হয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভবত এগুলোর উৎসমূলে আদিকালের 'ডাকার্নব' ছিল এবং পরবর্তীতে আসামে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রবচন রচয়িতারা বিভিন্ন সময়ে ডাকের বচন নির্মাণ করেছেন। সম্ভবত ডাকের বচনের প্রথম প্রচার এবং আরম্ভ আসামেই হয় পরে তা বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা এবং আসামের ভাষার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। আসামী ভাষা বর্তমানে ভিন্ন ভাষা হয়ে উঠলেও মূলতঃ তা বাংলারই একটি উপভাষার মতো। সুতরাং একই ভাষার রচনা আঞ্চলিক পরিবর্তনসহ বাংলা এবং আসাম উভয় অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে। ডাকের বচন উড়িষ্যাতেও অল্পস্বল্প পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রেও একথা বলা যায় যে উড়িষ্যার ভাষাও বাংলার উপভাষার মতোই। শুধু মাত্র লিখন পদ্ধতিতে বিশিষ্টার্থক হয়েছে। আর আসামী লিপি এবং বাংলা লিপি তো প্রায় একই। সুতরাং ডাকের বচনকে কোনো বিশেষ ভাষার অঞ্চলের সম্পদ হিসাবে গণ্য না করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রবচন হিসেবে গ্রহণ করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে। মূলে 'ডাকার্নবে' তন্ত্রের ডাকিনীদের কথা থাকলেও তার সঙ্গে সংসার জীবন যাপনের উপদেশাত্মক অনেক কথাও এসেছে

কিন্তু পরবর্তীতে ডাকের বচন কৃষি ও ক্ষেতখামারের কর্মসাধনের কথাই একমাত্র প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। আসামে ডাকের বচনের মধ্যে কিছু আরবী ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে বচনগুলি নিশ্চয়ই ইসলামের আগমনের পরবর্তীকালের রচনা। সেগুলোর দ্বারা ডাকের বচনের সময় কাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়।

ডাকের বচন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসা যায়:

১ ডাক কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। ডাকের অর্থ হচ্ছে 'বুদ্ধি-বন্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ বা সূক্ত'।

২ ডাকের বচনের প্রথম শৃঙ্খলিত সংকলন 'ডাকার্ণবে' পাওয়া যায় যা সম্ভবতঃ অষ্টম শতকের।

৩ চারণ কবিদের দ্বারা গীত হয়ে এ-সমস্ত বচন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এগুলোর রূপান্তর ঘটেছে।

৪ ডাকের বচনের প্রধান বিষয় কৃষি। অবশ্য কৃষি ছাড়াও সেখানে বিবাহ, সামাজিক সম্বন্ধ ইত্যাকার অনুষ্ঠানের সময়কাল নির্ধারণ বিষয়ে বক্তব্য আছে। এক কথায় প্রাচীন বঙ্গ এবং অহমিয়া সমাজের সামাজিক, আর্থিক এবং বুদ্ধিগত উপলব্ধির চিত্রাঙ্কন আছে।

৫ ডাকের বচনের মধ্যে কখনও কখনও বৌদ্ধ আচার এবং নৈতিকতার সিদ্ধান্ত, প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এর ফলে পাল রাজত্ব-কালেই এগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল। এ রকম ধারণা করা অন্যায় হবে না। অধ্যাপক হেম বরুআ তাঁর 'অসমিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে এ-রকম ইঙ্গিত রেখেছেন।

৬ ডাকের বচনের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত যেমন এসেছে তেমনি আবার ইসলামের প্রভাবে আরবী-ফারসী শব্দও এসেছে। তাহলে আমরা ডাকের বচনের কাল-বিস্তৃতি অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক বলতে

পারি। চতুর্দশ শতকে সীমারেখা টানতে চাই এ-কারণে যে এর পর বৈষ্ণব তন্ময়তায় আসাম, বাংলা এবং উড়িষ্যা সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছিল। বৈষ্ণবীয় প্লাবনে এ-সমস্ত অঞ্চল একটি মাত্র কাব্য প্রবৃত্তির বশংবদ হয়েছিলো।

৭ জ্যোতির্বিদ্যা, শুভ-অশুভ গণনা, আচার এবং ব্রতের প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে সরহপা তাঁর দোহাকোষে অনেক কথা বলেছেন। তিনি তাঁর সময়কালের বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মন্তব্য রেখেছেন। এ-সমস্ত কুসংস্কারের সমর্থন ডাকের বচনে পাওয়া যায়।

ডাকের বচনের চাইতে খনার বচন বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই খনার বচনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসিদ্ধি আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে ফসলের উৎপাদন, বীজবপন, ফসল কর্তন এগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত বিষয়ে খনার বচনে বিভিন্ন নির্দেশাবলী পাওয়া যায়। বহুলাংশে এ নির্দেশাবলী জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। ডাকের বচনে যতটা নয় তার চেয়ে অধিক পরিমাণে খনার বচনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ বাংলাদেশে ঋতু বিভাগ ছয়টি—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। সূর্যের বার্ষিক গতির কারণে এই ঋতু বিভাগ ঘটে থাকে। সুতরাং ঋতুর কার্যকারণের জন্য সূর্যই হচ্ছে নিয়ন্তা। ঋকবেদে সূর্য চন্দ্রের পরিক্রমার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে সূর্য এবং চন্দ্র তাদের নিজ নিজ শক্তিতে ভ্রমণ করছে। মনে হচ্ছে যেন ক্রীড়াপরায়ণ দুটি শিশু যজ্ঞের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি সমগ্র জগতের উপর দৃষ্টি রেখেছে এবং অন্যটি ঋতু বিভাগ নির্ণয় করে বার বার আবির্ভূত হয়েছে। ঋকবেদেও ছ'টি ঋতুর কথাই বলা হয়েছে। তবে কখনো কখনো হেমন্ত ও শীত এই দুটি ঋতুকে একই ঋতু ধরে নেওয়া হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, "পাঁচটি ঋতু বলা যেতে পারে, কারণ হেমন্ত ও শিশির একই ঋতু বললেই চলে।" 'কালমাধব' নাম একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থে ঋতুনির্ণয় অধ্যায়ে হেমন্ত ও শিশিরকে একই ঋতু বলে গণনা করা হয়েছে। প্রাচীন কাব্যেও আমরা এভাবেই ঋতু বিভাগ দেখি। ছয় ঋতুর জন্য যে মাসগুলো আছে সে মাসগুলো হচ্ছে মধু ও মাধব

বসন্ত মাস। এ সময় তরুরাজি পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুক্র ও সূচী গ্রীষ্ম ঋতুর মাস, এসময় সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল ও প্রখর হয়। নভস্ ও নভস্য বর্ষা ঋতুর মাস। ঈষ ও উর্জ শরৎ ঋতুর মাস, এ সময় ধান্যাদি পরিপক্কতা লাভ করে। সহস্ ও সহস্য শীত ঋতুর মাস, এ সময় শীত ঋতু সকল প্রাণীকে নিজ শক্তির বশীভূত করে। তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস, এ সময় দ্রব্যাদি জমে যায়। এ নামগুলো ভারতবর্ষে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগেও প্রধানতঃ। পরে এ নামগুলো পরিবর্তিত হয়ে চৈত্র বৈশাখ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এই সমস্ত ঋতু গণনার সঙ্গে কৃষিকার্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বিবেচনা করে খনার প্রবচনগুলো রচিত হয়েছে। খনা গ্রহনক্ষত্রের শুভাশুভ গণনা করেছেন এবং তার উপর নির্ভর করে কৃষি সম্পর্কে নির্দেশাবলী দিয়েছেন। এই শুভাশুভ নির্ণয়ের মধ্যে সামুদ্রিক বিদ্যা এসেছে, করকোষ্ঠি বিচার এসেছে, দৈব গণনা এসেছে, জাতক তত্ত্ব এসেছে। মানুষের উপর দিনের প্রভাব কি রকম পড়ে অথবা মাসের প্রভাব অথবা ঋতুর প্রভাব সেগুলো খনার বচনে আমরা পাই। আব-হাওয়ার ফলাফল সম্পর্কে মাস ও ঋতুভিত্তিক বক্তব্য খনার বচনে আমরা পাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করছি :

১ কোদাল কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা ॥
বলগে চাষায় বাঁধতে আল ।
আজ না হয় হবে কাল॥

২ পৌষে গরমি বোশেখে জাড়া ।
প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া ॥
খনা বলে শুন হে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদরে হবে না পানি॥

৩ কি কর শ্বশুর লেখা জোকা ।
আষাঢ়ে নবমী শুক্ল পখা ॥
যদি বর্ষে রিমিঝিমি ।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী ॥

৪　শনি রাজা মংগল পাত্র।
চষ খোর এই মাত্র ।

৫　মধু মাসে প্রথম এই দিনে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মংগল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার॥

সোম শুক্র গুরু আর ।
পৃথ্বী সয়না শস্যের ভার॥
পাচ শনি পায় মীনে ।
শকুনী মাংস না খায় ঘিনে॥

পাচ রবি মাসে পায়।
ঝরায় কিংবা খরায় যায়॥

খনার বচনে বর্ষা ঋতু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বর্ষা ঋতু হচ্ছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য। এই ঋতুর উপর নির্ভর করেই এই অঞ্চলের কৃষিজাত শস্যের উদ্ভব এবং প্রবৃদ্ধি। একটি ধারণা করা হয়ে থাকে যে বর্ষা ঋতু থেকেই বর্ষ গণনার সূত্রপাত। এ ধারণা অনেকে করেছেন বর্ষ শব্দটির জন্য। এ সম্পর্কে যথার্থ তথ্য অনুপস্থিত। খনার বচনেও এ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। অনুমান করা যেতে পারে যে সম্ভবত কোনো না কোনো সময়ে বর্ষা ঋতুতে বৎসরের আরম্ভ হত এবং সে কারণে বৎসরকে বর্ষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূর্যের দক্ষিণায়ন গতির আরম্ভের সঙ্গে বৎসরেরও আরম্ভ হত এ রকম ধারণা করা যেতে পারে। কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্রে'র 'কালমান' অধ্যায়ে বলেছেন যে তাঁর সময়কালে আষাঢ়ের শেষে কর্কটক্রান্তিতে বৎসরের আরম্ভ হত। 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ঋতু-চক্রের আরম্ভ হয় আষাঢ় মাস থেকে এবং উক্ত গ্রন্থে ঋতুগুলির ক্রম-ধারা বর্ণিত হয়েছে বর্ষা থেকে, যেমন বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম। অর্থাৎ বৎসরের আরম্ভ হয়েছে বর্ষা ঋতু থেকে। এখানে অবশ্য পাঁচটি ঋতুর কথা বলা হয়েছে। বিখ্যাত জ্যোতিষী বরাহমিহিরের কথা খনার বচনে অনেকবার এসেছে। বরাহমিহির ফাল্গুন মাসের বিষুবন্ থেকে বর্ষারম্ভ ধরেছিলেন। কিন্তু 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে বৎসরের আরম্ভ মকরক্রান্তি থেকে ধরা হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তে মকর ক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে আমরা ঋতুগুলির নিম্নরূপ সন্নিবেশ

পাই—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। দেখা যাচ্ছে যে সূর্যসিদ্ধান্তে বরহমিহিরের পূর্বের ব্যবস্থা মান্যতা পেয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ষারম্ভ এবং ঋতুচক্র নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এগুলোর উপর নির্ভর করে পঞ্জিকা তৈরী হয়েছে। খনার বচনের মধ্যে বর্ষারম্ভ এবং ঋতুচক্রের নানাবিধ তাৎপর্যপূর্ণ অনুশীলন আছে। খনা মূলত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে ঋতুচক্র বিষয়ে তাঁর মন্তব্য করেছেন। তৎসঙ্গে আপন বিজ্ঞতা, জীবনবোধ, সংস্কার এবং বঙ্গ সমাজে ও নিকটবর্তী দেশসমূহের সমাজব্যবস্থায় যে সমস্ত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তার উপর নির্ভর করে মানুষের কর্ম-কাণ্ডের জন্য একটি নৈতিক শাসন বিধিবদ্ধ করেছেন। খনার বচনের মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় সমাজজীবনের একটি বিস্তারিত পট-ভূমি আমরা আবিষ্কার করি। উক্ত সমাজে যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কার ছিল তার প্রতিফলন খনার বচনে লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যমান লক্ষণ দেখে অন্তর্লীন তাৎপর্যকে আবিষ্কার করা খনার বচনগুলির বৈশিষ্ট্য। ভারতের পূর্বাঞ্চলে যেমন পূর্বকালে তেমনি এখনো অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শস্যহানি ইত্যাদি ঘটে থাকে। খনার বিভিন্ন বচনে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে গণনার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে কেনো এ সমস্ত ঘটে থাকে। অর্থাৎ কোন্ গ্রহের কোন্ প্রকার অবস্থিতির কারণে খরা বা অনাবৃষ্টি হয় অথবা শস্যহানি ঘটে। বরাহমিহির যে ভাবে তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার সাহায্যে শুভাশুভ বা কল্যাণ অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন খনার বচনেও অবিকল তারই প্রতিবিম্ব আমরা পাই। খনার বচনে সন্তান জন্ম বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। গর্ভস্থ সন্তানের আয়ু এবং ভবিষ্যৎ গণনা খনার বচনের একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক। ভারতের পূর্বাঞ্চলের অবধী সাহিত্যে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে দিনক্ষণ গণনা এবং শুভাশুভ গণনা কাহিনীকাব্যের অন্তর্গত একটি প্রথাভিত্তিক বিবরণ। দেখা যায় যে দীর্ঘ সময় ধরে এ সমস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত বিশ্বাস এবং সংস্কার বদ্ধমূল ছিল সেগুলোরই নিদর্শন খনার বচনে সুস্পষ্ট হয়েছে। সরহপা অষ্টম শতকে তাঁর দোহাকোষে বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন যুগেও এ সমস্ত সংস্কার প্রচলিত ছিল। খনা এ সমস্ত সংস্কারের প্রতীক।

গর্ভবতী নারী সম্পর্কে বাংলাদেশে বহুবিধ কুসংস্কার আছে। যেমন এলোচুলে সন্ধ্যার সময় ঘরের বাইরে আঙ্গিনায় নামতে পারবে না, স্বামী সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণের দিকে তাকাতে পারবে না—তাকালে সন্তান অন্ধ হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। তা ছাড়া সহজ প্রসবের জন্য মাদুলী ব্যবহার এবং আরও নানাবিধ নিয়ম পালন আছে। সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার প্রথাও আছে। খনার বচনে আমরা পাচ্ছি :

গ্রাম গর্ভিনী কুলে সুতা ।
তিন দিয়ে হয় পুতা ॥
একে সুত দুয়ে সুতা।
শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা ॥

এর অর্থ হল, যে-গ্রামে রমণীর বাস সে-গ্রামের নামের সংখ্যা, গর্ভবতী রমণীর নামের শব্দ সংখ্যা এবং প্রসবের প্রস্তুতির সময় রমণী একটি ফুলের নাম করবে সে-নামের শব্দ সংখ্যা—এ-তিনটি সংখ্যা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগফল ১ হয়, তাহলে সন্তান ছেলে হবে। ২ হলে সন্তান মেয়ে হবে, ০ হলে গর্ভপাত হবে।

সংস্কৃত 'সুশ্রুত' এবং 'বিদেহতন্ত্রে'ও এ-ধরনের কিছু বিচার আছে। সুশ্রুতে আছে, "যুগ্মদিকে অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ দিবসে নারীর গর্ভসঞ্চার হলে পুত্র, এবং অযুগ্ম অর্থাৎ তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশাদি দিবসে গর্ভসঞ্চার হলে কন্যা জন্ম লাভ করবে।" 'বিদেহতন্ত্রে' 'সুশ্রুত'র বক্তব্যের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, "যুগ্মদিনে স্ত্রীগণের রজঃ অল্পতর হয় বলে গর্ভপ্রসবে পুত্র এবং অযুগ্মদিনে রজঃ অধিক হয় বলে কন্যার জন্ম হয়।"

সংস্কৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বক্তব্যে বিশ্লেষণ আছে এবং একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা আছে—কিন্তু খনার বচন এখানে সহজ সরল গ্রামীণ আদিমতার সংস্কার বহন করছে। এ-ধরনের প্রবচন খনার নামে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। এগুলোর কোনোটাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সত্য বলে নির্বাহিত হবে না।

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে এতদঅঞ্চলের গ্রামীণ গৃহস্থ এবং নিম্নবিত্তের সম্প্রদায় যাদের জীবনধারা সরহপা ও অন্যান্য বৌদ্ধ গীতিকারগণের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে খনার প্রবচনগুলো প্রধানতঃ সেসব লৌকিক শ্রমজীবী মানুষের জন্যই। এ-প্রকৃতির প্রচলন খনায় অনেক আছে। নিম্নে আরও কয়েকটি প্রদর্শিত হল :

১ নামে মাসে করি এক।
তার দ্বিগুণ করে দেখ ॥
সাতে পুরি আটে হরি।
সমে পুত্র বিসমে নারী ॥

অর্থাৎ গর্ভে পুত্র আছে না কন্যা আছে তা'জানতে হলে গর্ভিণীর নামের অক্ষরের সংখ্যার সঙ্গে যত মাসের গর্ভ সে-কয় মাসের সংখ্যা যোগ করে, যোগফলের দ্বিগুণ সংখ্যা নির্ধারিত করে তার সঙ্গে ৭ যোগ করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত যোগফলকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যদি যুগ্ম হয় তাহলে পুত্র এবং অযুগ্ম হলে কন্যা হবে।

২ বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ।
পেটের ছেলে গুণে আন॥
নামে মাসে করি এক।
আটে হরি সন্তান দেখ ॥
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারীর পুত্র জান ॥
দুই চারি থাকে ছয় ॥
অবশ্য তার কন্যা হয় ॥
যদি থাকে শূন্য সাত।
তবে নারীর গর্ভপাত ॥

অর্থাৎ 'বাণ' হচ্ছে পাঁচ, সুতরাং ৫ এর পিঠে ৫ হল ৫৫। গর্ভিণীর নামের অক্ষরের সংখ্যা, যত মাসের গর্ভ সে-কয় মাসের সংখ্যা ৫৫-এর সঙ্গে যোগ করে ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যদি ভাগশেষ ১, ৩ ও ৫ হয় তা'হলে পুত্র সন্তান হবে এবং যদি ২, ৪, ৬ থাকে তা' হলে কন্যা সন্তান হবে। যদি শূন্য অথবা ৭ থাকে তাহলে গর্ভপাত হবে।

এ-সব মেয়েলী পরীক্ষা প্রাকৃত জনের। বিজ্ঞানব্রতীদের নয়। অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে যে-ধরনের সমাজব্যবস্থা বঙ্গ অঞ্চলে ছিলো সেগুলো সংস্কৃত-অভিমানী আর্যাবর্তের সম্ভ্রান্ত মানব-গোষ্ঠীর নয়। এগুলো গ্রামীণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে গড়ে উঠেছে।

খনার বচনের উদ্ভব কখন ঘটে বলা কঠিন। তবে কতদিন পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল তা বলা যায়। এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনার বচন মেনে চলে, শুভাশুভ গণনায় ততটা নয় যতটা কৃষিকর্মের নির্দেশনায়। ডাকের বচনের মতোই খনার বচনও অত্যন্ত প্রাচীন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটা প্রচলিত আছে এটা ধারণা করা যেতে পারে। সরহপার উক্তিতে মনে হয় তার সময়কালে শুভাশুভ গণনা, করকোষ্ঠি পরীক্ষা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সে সময় গ্রামীণ জীবনের বিবিধ কর্মকাণ্ডে নিশ্চয়ই ডাক এবং খনার বচনের উপর নির্ভরতা ছিল। অথবা কিছু প্রবচন অবশ্যই ছিল যেগুলো পরবর্তীতে ডাকের বচন বা খনার বচন নামে চিহ্নিত হয়েছে।

ডাকের বচনের উদ্ভব সম্ভবত আসামে কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা-দেশেও ডাকের বচন নির্মিত হয়েছে। কিন্তু খনার বচনের উদ্ভব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে। পরে এ বচনগুলো বিহার, উড়িষ্যা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতু ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উপর খনার প্রবচন পাওয়া যায়। কখন ইক্ষু বুনতে হবে কি ধরনের মাটিতে বুনতে হবে, একটি গাছের থেকে অন্য গাছের ব্যবধান কতটুকু থাকবে এ সমস্ত বর্ণনা খনার বচনে আছে। কলা গাছ কোন্ ঋতুতে বুনতে হবে, একটি গাছের থেকে অন্য গাছের দূরত্ব কতটুকু হবে এবং কিভাবে গাছের পরিচর্যা করতে হবে তা খনার বচনে আমরা পাই এবং আমরা দেখি খনার বচনের নির্দেশগুলো অসম্ভব যৌক্তিক। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের নিয়মকানুন অনুসারেও খনার বচনকে অব-হেলা করা সম্ভবপর নয়। খনার বচনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের ক্রিয়াকর্ম দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী, সংসার যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাগমের পরিকল্পনা এগুলো খনার বচনে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। খনার বচনের মধ্যে এককালীন বঙ্গসমাজের

সাংস্কৃতিক এবং কর্মজীবনের প্রতিচ্ছায়া সুস্পষ্ট। খনার বচনের সংখ্যা কত তা বলা কঠিন তার কারণ উৎস কাল থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে এ সব প্রবচনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এবং এখনো হয়তো কোনো কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা মুখে মুখে খনার বচন তৈরী করে চলেছে। খনা প্রাচীন বাংলাদেশের একজন জ্যোতিষী রমণী ছিলেন। এ সম্পর্কে সম্ভবত সন্দেহের অবকাশ নেই। বরাহমিহির যেমন একজন জ্যোতিষী ছিলেন খনাও তেমনি। কিন্তু বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায়। খনার রচিত কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু খনার নামে প্রচলিত প্রভূত পরিমাণ সূক্তি এবং প্রবচনই আমরা পাই।

খনার বচন সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি:

১ খনা একজনের নাম অথবা ছদ্মনাম যিনি জ্ঞানী, বিদ্যাবত্তায় প্রাচীন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। যে সমস্ত পদ বা প্রবচনের মধ্যে রাশিফল, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বরাহমিহিরের উল্লেখ আছে—সেগুলো বিশেষ কোনও ব্যক্তির রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তিতে মুখে মুখে সৃষ্ট অনেক প্রবচন খনার নামে চলিত হয়েছে কিন্তু আদিতে এগুলোর বিশিষ্ট রচয়িতা একজন নিশ্চয়ই ছিলো।

২ সরহপার রচনায় তৎকালীন সমাজজীবনে জ্যোতিষশাস্ত্র, রাশি-ফল ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্রয় সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। খনার প্রবচনে এ-হেন প্রশ্রয় আমরা লক্ষ্য করি। এভাবে খনার আবির্ভাবকাল অষ্টম শতক হতে পারে এ রকম চিন্তা করা অন্যায় হবে না।

৩ খনার কৃষিভিত্তিক সকল রচনাই বঙ্গ-অঞ্চলের কৃষিজীবনের পরিচয় বহন করছে তাতে খনা যে বাঙ্গালী ছিলেন এ-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

৪ খনার প্রবচনগুলো এককালীন বাঙ্গালী গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য। বাঙ্গালীর সমাজ, সংস্কার এবং পেশা খনার প্রবচনে উজ্জ্বল-ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

খনার বচনে যে-সমস্ত কৃষিজাত শস্য এবং ফলসমূহের উল্লেখ আছে তা সবই বাংলাদেশের। অবশ্য বাংলার বাইরেও উড়িষ্যা ও আসামে এগুলো উৎপন্ন হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলো বাংলাদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং কৃষিভিত্তিক জীবনের জীবিকার্জনের উপায়। এ-সমস্ত শস্য ও ফলমূল হচ্ছে—ভুট্টা, কমলা, আক, আদা, পুই, মূলা, তুলা, ডালিম, খেজুর, নারিকেল, সুপারী, কাঁঠাল, তাল, সরিসা, ধান, পান, কলা, হলুদ, বেগুন, ইত্যাদি। রেশম চাষের কথাও খনার বচনে আছে। এ-সমস্ত শস্য ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য মাটির প্রকৃতি নির্ধারণের প্রয়োজন। পানি সিঞ্চন এবং সেচনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বপনের কাল নির্ণয় আবশ্যক এবং পরিচর্যার পদ্ধতিও জানতে হবে। বিস্ময়করভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে খনার বচনে এ-সমস্ত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে কৃষিনির্ভর মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তঃসার খনার বচনে ধরা পড়েছে। এমন কি বর্তমান কালে কৃষির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও খনার বচনের গুরুত্ব নষ্ট হয়নি। বাংলাদেশ সরকার ননফরমাল এডুকেশন বলে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন তার সভাপতি হিসাবে আমি বাংলা-দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করি। তাতে আমি লক্ষ্য করি যে সাধারণ গ্রামীণ গৃহস্থরা এখনো খনার বচনের মর্যাদা দিয়ে থাকে। কৃষিজাত শস্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে সেগুলো বপন, পরিচর্যা এবং কর্তনের রীতি নির্ধারণ করা অনেক জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু খনার বচনের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ত নির্দেশনায় এগুলো কৃষকদেরে প্রেরণা দিয়েছে এবং সাহায্য দিয়েছে।

খনার বচনের ভাষা পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় তার কারণ এ ভাষায় প্রাচীনত্ব নেই। লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে এ বচনগুলোর বাণীভঙ্গি সর্বদাই সাম্প্রতিক হয়েছে। চর্যাগীতিকার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি লোকমুখে গীত হতে হতে 'চচা' সঙ্গীতে রূপান্তরের মাধ্যমে তা বর্তমান নেপালের নেওয়ারী ভাষায় পরিণত হয়েছে। তেমনি বহুল প্রচলনের কারণে এবং জনসাধারণের কর্মসিদ্ধির নির্দেশ বাহক বলে খনার প্রবচনগুলি সমসাময়িককালের ভাষা প্রবাহ-কেই অবলম্বন করেছে। একই কথা ডাকের বচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খনার প্রবচনে অনেক আরবী ফারসী শব্দ আছে—যেমন ইনাম, বখশিস ইত্যাদি। বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের পর এ শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। চর্যাগীতিকা ছিল বিশেষ এক ধর্মীয় গোত্রের সাধনতত্ত্বের রূপরেখা, তাই সেগুলো একটি সীমা-বদ্ধতার মধ্যে একটি সময়ের ভাষার স্বভাবকে মোটামুটি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু খনার বচনের ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায় না। খনার বচন ছিল আপামর সাধারণ সকল মানুষের সামগ্রী। এর ফলে খনার বচনের ভাষা কোনো প্রকার আঞ্চলিক ভাষার স্বভাব পায়নি বরঞ্চ সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষায় পরিণত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থিত করছি:

১ খনা বলে শুন কৃষকগণ।
লাল লয়ে মাঠে যাবে যখন॥
শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।
মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ।
পূর্ব্ব দিক হতে কর হাল চালন॥
তা হলে তোর সমস্ত আশয়।
হইবে সফল নাহি সংশয়।

২ পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ হয় চিরকাল॥
তার বলদের হয় বাত।
তার ঘরে না থাকে ভাত॥
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে জানি॥

৩ ষোল চাষে মূলা।
তার অর্ধেক তুলা॥
তার অর্ধেক ধান।
বিনা চাষে পান॥
খনার বচন।
মিথ্যা হয় না কদাচন॥

পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে এ-সব প্রবচনগুলোর ভাষা অত্যন্ত সংহতিপূর্ণ, সুমার্জিত। বাংলাদেশের কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা এগুলো নয়। বাংলা সাধু ভাষার মতো এ ভাষা সর্বঅঞ্চলেরই ভাষা এবং তদুপরি তা আধুনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই খনার বচন বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হতে থাকে এবং সেকালে যারা সংগ্রহ করে-ছিলেন তারাও লোকমুখ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো পাণ্ডুলিপির সাশ্রয় তাদের ছিল না। বৃটিশ আমলে ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। এর ফলস্বরূপ আমরা অবধী ভাষার বহু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হতে দেখি এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতেও দেখি। সে সময় অবধী, ফারসী, আরবী এবং সংস্কৃত পাণ্ডু-লিপি ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ প্রধানত সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে কোনো পাণ্ডুলিপি তারা সংগ্রহ করেননি। একমাত্র বাংলা মধু-মালতী পুথির একটি পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে পাওয়া যায়। এই সংগ্রহকার্যে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলটি উপেক্ষিত হয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই এ অঞ্চল থেকে খনার প্রবচনগুলি সংগৃহীত হয়নি। তাছাড়া লোকমুখ থেকে কোনো কিছু সংগ্রহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও সে সময় নিরূপিত হয়নি। এসব কারণে খনার বচনটি বিবেচনার বাইরেই থেকে যায়। বৃটিশ সিভিলিয়ানরা কিন্তু লোকসঙ্গীত এবং লোকসাহিত্য সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন এবং সেগুলো তারা সে সময় প্রচুর সংগ্রহও করেছিলেন। সম্ভবত লোকসঙ্গীতের গায়কী পদ্ধতিতে তারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের নিজ নিজ দেশেও লোকসঙ্গীত সংগ্রহের একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই বলা যেতে পারে যে খনার বচন সংগ্রহের বাইরে থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত হওয়ায় এবং নীল চাষ প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষিকর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। তখন খনার বচনের গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। ইংরেজরা গ্রামীণ লোকগাথা এবং লোকসঙ্গীত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সংগ্রহ করা আরম্ভ করেন। এ সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে প্রবাদ ছিল, দৃষ্টান্ত বাক্য ছিল, লোককাহিনী ছিল, কিছু প্রচবনও ছিল কিন্তু খনা কিংবা ডাকের বচন এ সব সংগ্রহের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কৃষি বিষয়ক কিছু পত্র-পত্রিকা

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। সে সব পত্রপত্রিকায় খনার বচনের উদ্ধৃতি ছিল এবং আলোচনা ছিল। ১৮৮৯ সালে খনার বচনের একটি সংগ্রহ 'বৃহৎ খনার বচন' নামে প্রকাশিত হয়। অন্য একটি সংগ্রহের নাম ছিল শুধুই 'খনার বচন'। তাছাড়া 'ডাক পুরুষের বচন' এবং 'ডাক পুরুষের কথা' নামক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে জ্যোতিষী প্রজাপতি দাসের 'পঞ্চস্বরা' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ কেউ কেউ করেছেন যার মধ্যে খনার বচন সংকলিত হয়েছিল। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক

বর্তমান পরিচ্ছেদ রচনার সময় আমি নির্ভর করেছি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল থেকে আনীত 'ডাকার্নব', রাহুল সাংকৃত্যায়নের সরহপার 'দোহাকোষ', সুকুমাররঞ্জন দাশের 'হিন্দুদিগের ঋতুবিভাগ ও বর্ষারম্ভ' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুর মাতৃভূমি ও স্বদেশ প্রেম' (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৪), শঙ্কর সেনগুপ্তর 'A Study of Women of Bengal' (Calcutta, Indian publications, 1970, ভারতের সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত এবং হেম বরুআ বিরচিত 'অসমিয়া সাহিত্য' এবং আলী নওয়াজ সম্পাদিত 'খনার বচন ও কৃষি' (বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা কাউন্সিল)।